নীতি সংক্ষেপ/পলিসি ব্রিফ

বাংলাদেশের নির্মাণ খাতের শ্রমিক অধিকার প্রসঙ্গ

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)
৬/৫ এ স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
মোবাইল ফোন: +৮৮০১৯৭৪ ৬৬৬৮৯০
ই-মেইল: info@safetyandrights.org
ওয়েবসাইট: www.safetyandrights.org

ঘোষণা: এই নীতি সংক্ষেপ/পলিসি ব্রিফ "বাংলাদেশের নির্মাণ খাতের শ্রমিক অধিকার" বিষয়ক গবেষনার ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়েছে। গবেষণা কার্যটি ইউএনডিপি'র লো-ভ্যালু গ্রান্ট'র অধীনে সম্পন্ন করা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, এ নীতি সংক্ষেপে যেসব তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণ হাজির করা হয়েছে তার সকল দায়-দায়িত্ব গবেষক ও প্রকাশকের, এক্ষেত্রে ইউএনডিপি, জাতিসংঘ বা জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের কোন ভুমিকা নেই।

নীতি সংক্ষেপ/পলিসি ব্রিফ

বাংলাদেশের নির্মাণ খাতের শ্রমিক অধিকার প্রসঙ্গ

১. ভূমিকা

বাংলাদেশে অতীব জরুরি এবং প্রয়োজনীয় একটি বিষয় হলো সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র এবং নানান ঝুঁকিতে থাকা মানুষদের জন্য কর্মসংস্থানের যোগান দেয়া। নির্মাণ খাত সেই সুযোগটা করে দেয়। বর্তমানে ৩৪ লাখেরও বেশি মানুষ এই খাতে কাজ করে এবং বার্ষিক জাতীয় আয়ের (জিডিপি) ৮ শতাংশ আসে এই খাত থেকে।

বাংলাদেশে নির্মাণ খাত আইনগতভাবে একটি আনুষ্ঠানিক ও সংগঠিত খাত হলেও শ্রম সম্পর্ক এবং এর চর্চা অনেকটাই অনানুষ্ঠানিক ধাঁচের। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ - এ শ্রমিক অধিকার ও সুরক্ষার বিভিন্ন দিক নিশ্চিত করা হয়েছে কিন্তু নির্মাণ খাতের কোম্পানিগুলো কার্যত এসব আইন ও বিধি-বিধানের বাইরে থেকে বা যথাযথভাবে অনুসরণ না করেই কাজ করে। এর মধ্যে রয়েছে ন্যূনতম মজুরি, বীমা সুবিধা, এবং ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও সংগঠিত হওয়ার অধিকারের মত অনেক বিষয়। স্বাভাবিকভাবেই, নির্মাণ খাতে শ্রম ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের খবর হরহামেশাই পাওয়া যায়। যাইহোক, নির্মান খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের অধিকার এবং সুরক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তেমন কোন সামগ্রিক অনুসন্ধান বা গবেষণা হয়নি বললেই চলে।

বর্তমান পলিসি ব্রিফ (Policy Brief) টি হলো বাংলাদেশের নির্মাণ খাতের কর্ম পরিবেশ নিয়ে তৈরি একটি বৃহৎ প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ। বাংলাদেশে নির্মাণ খাতে শ্রম অধিকার তদারকিতে যেসব বিধি-ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে, সেগুলো জাতিসংঘের ব্যবসা ও মানবাধিকার বিষয়ক নীতিনির্দেশনা মোতাবেক (United Nations Guiding Principles--UNGPs) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ড ও প্রথার আলোকে কতটা কার্যকর ও যথাযথ ভূমিকা রাখছে সেটাই মূল প্রতিবেদনে যাচাই করে দেখা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছিল নির্মাণ খাত সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা আইএলও'র সনদগুলোকে। নির্মান খাতের কর্মপরিবেশের বাস্তব অবস্থার একটি সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপনের পাশাপাশি এই পলিসি ব্রিফটিতে এ খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের অধিকারসমূহ সঠিক এবং কার্যকর বাস্তবায়নে বেশ কিছু সুপারিশমালা প্রদান করা হয়েছে।

ব্যবসা ও মানবাধিকার

জাতিসংঘ যখন বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার সুরক্ষায় ভূমিকা রাখার দায়িত্ব নেয় তখন প্রাথমিক বিবেচনা ছিল ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের করণীয় বিষয়ে। কিন্তু, সেই বিবেচনাসমূহের পরিসর কালে কালে অনেক বেড়েছে। তাতে যুক্ত হয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি এবং বেসরকারি খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়-দায়িত্বের প্রশ্ন। যেমন, ইতোমধ্যে স্বীকৃত যে, ব্যবসায় সক্রিয় বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর মানবাধিকার বিষয়ে নিম্নোক্ত দায়-দায়িত্ব রয়েছে।

- কোম্পানির নিজস্ব কর্মচারী এবং 'সাপ্লাই চেইন' বা তার ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়ায় যুক্ত অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিদের ক্ষেত্রে;
- ভোক্তাসমাজ যারা কোম্পানির সরবরাহকৃত পণ্য এবং পরিষেবাগুলি ক্রয় করে থাকে—তাঁদের বেলায়;
- কোম্পানির কর্মস্থলসমূহের আশেপাশে বসবাসরত মানুষদের বেলায় - যাঁদের জীবন কোম্পানির কর্ম তৎপরতা দ্বারা প্রভাবিত হয়; এবং
- সমাজের অন্যান্যরা - যাঁদের কোন অধিকার কোম্পানির সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা প্রভাবিত হয়।

সাধারণত রাষ্ট্র এবং ব্যবসায়িক উভয়ের ভূমিকার কারনে অনেক ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী কর্পোরেট মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়। একটি কার্যকরী নিয়ন্ত্রক কাঠামোর অনুপস্থিতির কারণে এটা ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে অধিকার লঙ্ঘিত হলে ভুক্তভোগীরা প্রায়ই যথাযথ প্রতিকার পায় না।

মানবাধিকারের উপর ব্যবসায়িক জগতের ভূমিকা ও প্রভাব ক্রমশই বাড়ছে। এরই স্বীকৃতি হিসেবে জাতিসংঘের তখনকার মহাসচিব কফি আনান ২০০০ সালে গ্লোবাল কমপ্যাক্ট ('Global Compact') নামের এক বৈশ্বিক সমঝোতা কাঠামোর সূচনা করেছিলেন। যেখানে কোম্পানিগুলোকে মানবাধিকার সুরক্ষায় তাদের দায়িত্বপালনে নয়টি নীতি মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছিল। পরে আরও একটি নীতি ঐ তালিকায় যুক্ত করা হয়েছিল। ঐ দশনীতির প্রথমটিতেই বলা হয়েছে, কোম্পানিগুলোকে অবশ্যই মানবাধিকারের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে।

এই প্রাথমিক পদক্ষেপের পর, ব্যবসা ও মানবাধিকারের আন্ত: সম্পর্ক নির্ধারনের জন্য জাতিসংঘ তিন ধরনের নীতি-নির্দেশনা তৈরি করে। যা এখন ব্যবসা ও মানবাধিকার বিষয়ে জাতিসংঘের তিনস্তম্ভ বিশিষ্ট নির্দেশনা-নীতিমালা বা UNGPs নামে পরিচিত। জাতিসংঘের ঐ তিনটি নীতি-নির্দেশনা মোটাদাগে বলছে:

> প্রথমত, মানবাধিকারের সুরক্ষা প্রদান রাষ্ট্রের দায়িত্ব।
> দ্বিতীয়ত, মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে; এবং
> তৃতীয়ত, মানবাধিকার যখন কোথাও যথাযথভাবে মর্যাদা পায় না বা সুরক্ষিত হয় না তখন যে শূন্যতা তৈরি হয় সেটা পূরণ ও প্রতিকারের দায়িত্ব রাষ্ট্র এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উভয়ের।

এই তিনটি মৌলিক নির্দেশনার পাশাপাশি জাতিসংঘের এ বিষয়ক নির্দেশনা-নীতিমালা (UNGPs) সর্বাবস্থায় কার্যকরযোগ্য একটা সাধারণ আন্তর্জাতিক কাঠামো তুলে ধরেছে- যাতে করে ব্যবসার সাথে মানবাধিকারের ধারণা সমন্বিত করা যায়।

ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের প্রতি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতার অর্থ শুধু এই নয় যে, তাদের কোন ক্ষতি না করা। বরং এই দায়বদ্ধতা এই প্রত্যাশাও অন্তর্ভুক্ত করে যে কোম্পানিগুলো সমাজে তাদের কাজের প্রভাব পর্যালোচনা ও মুল্যায়ন করবে। তাদের দ্বারা কারো অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে কি না সেটা দেখবে। যদি সেরকম কিছু ঘটে, অর্থাৎ কোম্পানির দ্বারা কারোর

ক্ষতির বিষয় যদি কোনভাবে যুক্তিযুক্ত প্রতীয়মান হয় তাহলে যেখানে বা যাদের বেলায় এটা ঘটেছে বা যারা ক্ষতির শিকার হয়েছে তাদের ক্ষতির মাত্রা প্রশমন বা দূর করায় সংস্থাগুলো পদক্ষেপ নেবে।

রাষ্ট্র বা কোম্পানির দায়িত্ব আইন পালন করা। যেসব জায়গায় আইনের প্রয়োগ হয় না, কিংবা সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনকারীরা তাদের দায়িত্ব পালন করে না- সেসব জায়গায় দায়িত্বের সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য কিংবা বলা যায়, দায়িত্ব ও বাস্তবতার ব্যবধান পূরণে নির্দেশনা দিয়ে থাকে জাতিসংঘের উপরোক্ত নির্দেশনা নীতিমালা। এই নীতিমালা এরূপ পরিস্থিতিতে এক ধরনের সহায়ক মূল্য তৈরি করে। ঠিক এ কারণে, উল্লিখিত নীতিমালাগুলো সর্বসম্মতভাবে ২০১১ সালে মানবাধিকার কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল এবং বর্তমানে বিশ্বব্যাপী অসংখ্য ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান দ্বারা সেগুলো সমর্থিত।

জাতিসংঘের নির্দেশনা-নীতিমালাগুলো (UNGPs) আগের যেকোন সময়ের চেয়ে ক্রমে অধিকতর প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে। কারণ সমগ্র বিশ্ব এখন এটি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছে এবং স্বীকার করছে যে, মানবাধিকারের উপর ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলোর প্রভাব অস্বীকারের উপায় নেই। প্রসঙ্গক্রমে একটা উদাহরণ তুলে ধরা যায়। এমুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে লাভজনক ১০টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত মূলধন জাপানের চেয়েও বেশি। এই ধরনের পরিসংখ্যান মানুষের জীবনের উপর ব্যবসায়িক জগতের ব্যাপক প্রভাব ও শক্তির চিত্র প্রদর্শন করে, যা আমাদের এতদিনের চিন্তার পরিসর অতিক্রম করে যায়। বর্তমানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বৈশ্বিক প্রচেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে উঠেছে।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় মিশ্র পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে, যেখানে পরিমাণগত এবং গুণগত উভয় ধরনের উপাদান বিবেচনায় নিয়ে নির্মাণ কাজের ধরন এবং নির্মাণ শ্রমিকদের অধিকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে নির্মাণ কাজের পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং এই খাতের কর্মীদের অধিকার পরিস্থিতি বিশ্লেষনের মাধ্যমে কর্মস্থলে ঝুঁকির জায়গাগুলো শনাক্ত করা হয়েছে এবং একইসাথে ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় আইন-কানুন এবং আরও যা করণীয় সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

বিদ্যমান জাতীয় আইনের অধীনে সংশ্লিষ্ট যেসব বিধান রয়েছে সেসবের পর্যালোচনা শেষে যে কাঠামো এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে তার অন্যতম ভিত্তি ছিল শোভন কাজের সূচকসমূহ। তাছাড়া মানবাধিকার ও শ্রম অধিকারের সূচকগুলোও এক্ষেত্রে বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

গবেষণায় একটি নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে দেশব্যাপী নির্মাণ শ্রমিকদের উপর একটি জরিপ পরিচালিত হয়। পাশাপাশি নির্মাণ শ্রমিক এবং তাদের প্রতিনিধিদের সাথে চারটি গ্রুপভিত্তিক আলোচনা, এবং নির্মান খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়জন গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তির একান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়। যারা হলেন– নির্মাণ কোম্পানির মালিক বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, নির্মান মালিক সমিতির প্রতিনিধি, শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং এই খাতের সাথে সম্পৃক্ত সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা। জরিপ, দলীয় আলোচনা ও বাছাইকৃত ব্যক্তিদের উল্লিখিত সাক্ষাৎকার এই গবেষণার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে কাজ করেছে।

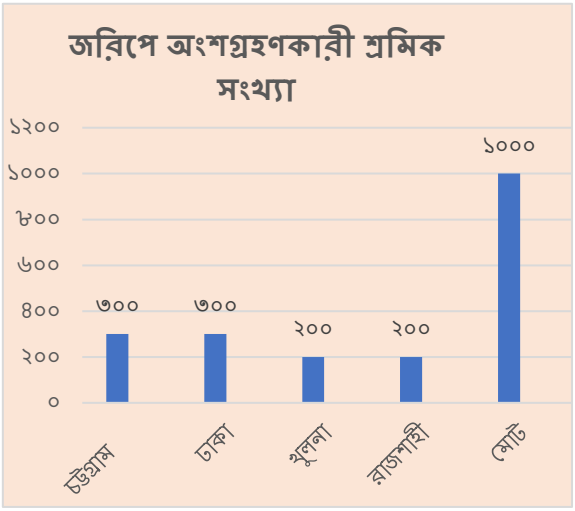

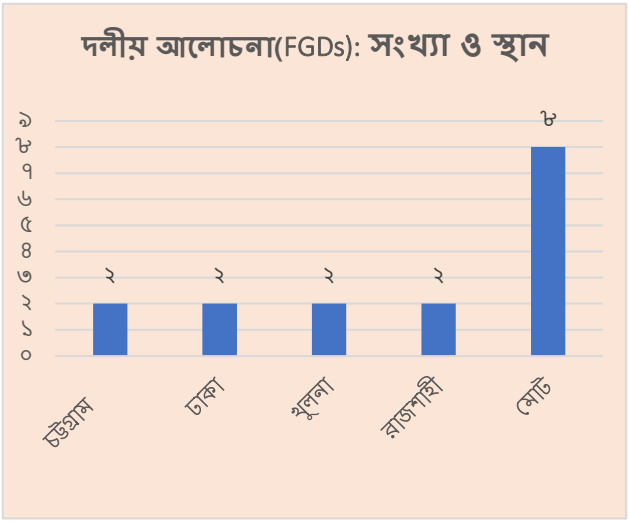

অধ্যায় পরিকল্পনা

এ গবেষণাটি তিনটি মূল ভাগে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম ভাগে আছে আইনগত এবং নীতিগত পরিস্থিতি। এখানে নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য বিদ্যমান আইন ও নীতিমালার কার্যকারিতার পরিসর, ঘাটতি এবং বাস্তবায়ন পরিস্থিতি গুরুত্বসহকারে দেখা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে শোভন কাজের পরিবেশ এবং তার ঘাটতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, মানবাধিকার এবং শ্রম অধিকারের সূচকগুলোর বিবেচনায় নির্মাণ শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থা দেখা হয়েছে, এবং তৃতীয় ভাগে রয়েছে, কৌশলগত পথ ও দিকনির্দেশনা। অর্থাৎ শোভন কাজের পরিবেশের ঘাটতি মোকাবেলায় নির্মাণ খাতের মালিক/নিয়োগকারীরা কী কী ধরনের পদক্ষেপ ও কৌশল গ্রহণ করতে পারে এবং এ খাতের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন মহল শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে কী কী উদ্যোগ গ্রহন করতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

২. নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য আইনগত ও নীতিগত কাঠামো

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ এবং শ্রম অধিকার সনদে অনুমোদন ও সম্মতি প্রদানের কারনে বাংলাদেশ শ্রমিকদের অধিকার সমুন্নত রাখতে বাধ্য। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা (UDHR), অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি (ICESR) এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি সহ শ্রম অধিকার বিষয়ে আইএলওর যে দশটি মৌলিক কনভেনশন রয়েছে তার আটটি বাংলাদেশ অনুমোদন করেছে। এছাড়া, শিশু অধিকার সনদ (CRC), এবং নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কনভেনশন (CEDAW) বাংলাদেশে শ্রম অধিকার সুরক্ষার অন্যতম ভিত্তি নির্দেশ করে।

দেশের ভেতরে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন হল তার সংবিধান। বাংলাদেশের সংবিধান তার নাগরিকদের সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা, কাজের বিপরীতে যুক্তিসঙ্গত মজুরি, কর্মসংস্থানে সমান সুযোগ এবং সামাজিক নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার প্রদান করেছে। এই সংবিধান

জবরদস্তিমূলক শ্রম নিষিদ্ধ করেছে এবং কাজকে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

দেশে কর্মসংস্থান বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন হল ২০০৬ সালে প্রনীত বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (বিএলএ ২০০৬) । এই আইন ট্রেড ইউনিয়ন, কর্মঘণ্টা, ন্যূনতম মজুরি, কর্মসংস্থান এবং শিল্প সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। নির্মাণ খাতের কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনগত বাধ্যবাধকতাগুলো নির্দিষ্ট রয়েছে মূলত বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড ২০২০ (বিএনবিসি)- এ।

চাকরির চুক্তিপত্র

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এ চুক্তিভিত্তিক কাজের শ্রমিক অধিকার বিষয়ক নানা বিধান (যেমন, নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র, সার্ভিস বুক, কর্মচারীদের নিবন্ধন বই এবং মালিক ও শ্রমিক কর্তৃক চাকুরি অবসানের ক্ষেত্রে উভয়ের করণীয় বিষয়ে বিশদ নির্দেশিকা) এর উল্লেখ রয়েছে। এ আইনে কর্মীদের পদত্যাগকালীন বিধি-বিধান যেমন- পদত্যাগের সময় প্রয়োজনীয় নোটিশ প্রদান/পাওয়া এবং চাকরি অবসানের পর ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিষয় উল্লেখিত আছে ।

কর্মঘন্টা

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিককে ওভারটাইম ছাড়া দিনে সর্বোচ্চ আট ঘণ্টা এবং সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘণ্টা কাজ করার অনুমতি দেয়। রাতের ডিউটির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন শর্ত দেয়, কোন মহিলাকে তার সম্মতি ছাড়া রাত ৮টা থেকে সকাল ৬ টার মাঝে কাজ করানো আইনসম্মত নয়। একইভাবে অল্প বয়স্ক কর্মীদের (১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী) সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত কাজ করা নিষেধ।

শিশুশ্রম নির্মূল

শিশুশ্রমের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রযোজ্য আইএলও সনদের অব্যাহতি বিধান প্রয়োগ করেছে। যে ধরনের কাজ শিশুর স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য ক্ষতির কারণ হবে না এমন ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১৪ বছর বয়সী শিশুদের কাজ করার যোগ্য বিবেচনা করা হয়েছে। তবে কোন ধরণের কাজ শিশুদের জন্য ক্ষতিকর এবং কোন ধরনের কাজ ক্ষতিকর নয় (শিশুশ্রমের নিকৃষ্টতম রূপসমূহ ব্যতীত) সে বিষয়ে আইন নির্দিষ্ট করে কিছু বলেনি । এছাড়া দেশে ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিদের জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকায় বিভিন্ন ধরনের কাজে চাকরির জন্য ন্যূনতম বয়স নির্নয় বেশ কঠিন হয়ে পড়ে।

জবরদস্তিমূলক এবং বাধ্যতামূলক শ্রমের বিরুদ্ধে সুরক্ষা

বাংলাদেশ সংবিধান জবরদস্তিমূলক সকল ধরনের শ্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং তা লংঘনের ক্ষেত্রে যথাযথ শাস্তির বিধানও বিদ্যমান। যদিও বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ এরকম কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষা

একই ধরনের কাজ বা একই ধরনের মূল্য তৈরি করে এমন কাজে নারী ও পুরুষ কর্মীদের সমমজুরি দিতে নিয়োগকর্তাদের বাধ্যবাধকতা আছে। যা একই বিষয়ে আইএলও সনদের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ কর্মক্ষেত্রে অন্যান্য বৈষম্যের

কারণগুলো (যেমন, জাতি, ধর্ম, এবং বর্ণ পরিচয়জনিত বৈষম্য) যথাযথভাবে বিবেচনা করে নি। অথচ কর্মক্ষেত্রে এভাবেও বৈষম্য ঘটতে পারে বা ঘটে থাকে।

মজুরি এবং কাজ-সম্পর্কিত অন্যান্য প্রাপ্ত সুবিধা

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী, মজুরির হার নির্ধারণ ও ঘোষণা করার জন্য সরকার একটি ন্যূনতম মজুরি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু মজুরি কাঠামোর মধ্যে সরকার কীভাবে উৎপাদনশীলতা এবং শ্রমিকদের সুরক্ষা এর মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখবে তার নির্দেশনা দিতে এ আইন ব্যর্থ হয়েছে । আইনটি নিয়মিত এবং সময়মতো শ্রমিকদের সমস্ত পারিশ্রমিক প্রদান করতে নিয়োগকারী বা মালিককে বাধ্য করে তবে কিছু কিছু অনুমোদিত ক্ষেত্রে শ্রমিকের নির্দিষ্ট পরিমাণে মজুরি কাটার অনুমতি দেয়।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, পিস রেট কর্মীদের জন্য ন্যূনতম মজুরি কীভাবে নির্ধারণ করা হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করেনি। এছাড়া, আইনটিতে উৎসব ভাতা (যা এশিয়াতে স্বাভাবিক বিষয়) এবং অন্যান্য ভাতা (যেমন, স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা, পরিবহন ও বিনোদন ভাতা) সম্পর্কিত বিধানেরও অভাব রয়েছে। এসব সিদ্ধান্তগুলি নিয়োগকর্তাদের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া রয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা

বাংলাদেশের শ্রম আইনে বীমা, ক্ষতিপূরণ এবং মাতৃত্বকালীন সুবিধার বিধান আছে। তবে গ্রাচুইটি এবং ভবিষ্য তহবিলসহ সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক সুবিধা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিধানের অভাব আছে। আইনের অধীনে গ্রাচুইটি হচ্ছে ঐচ্ছিক, এবং ভবিষ্যত তহবিলের বেলায় কোনও প্রতিষ্ঠানের মোট কর্মীদের তিন-চতুর্থাংশকে অবশ্যই নিয়োগকর্তার নিকট উক্ত তহবিল গঠনের জন্য অনুরোধ জানাতে হবে। একইভাবে, একজন নিয়োগকর্তা যদি ১০০ জনের কম লোক নিয়োগ করেন সেক্ষেত্রে তার সংস্থায় গ্রুপ বীমার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যার কারণে অনেক কোম্পানি শ্রমিকদের সাথে কাজের আনুষ্ঠানিক চুক্তির সংখ্যা কমিয়ে দেখায়।

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য

কর্মীদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণের সাথে প্রাসঙ্গিক দায়িত্বসমূহ বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোডে (বিএনবিসি) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার জন্য একটি সাধারণ দায়িত্ব আরোপ করে- যা বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এ নেই কিন্তু শ্রমিকদের সুরক্ষায় মালিক, ডেভেলপার, ঠিকাদার এবং প্রকৌশলীর দায়িত্ব কীভাবে আলাদা হতে পারে তা বিএনবিসি উল্লেখ করেনি। তাদের সকলকে শুধু বিএনবিসি'র নির্দেশনা মেনে চলতে বলা হয়েছে।

নিরাপত্তা-সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, তথ্য ও নির্দেশনা প্রদান বা তত্ত্বাবধানের বিষয়েও বিএনবিসি কোনো পক্ষের উপর দায়িত্ব আরোপ করেনি। তার পরিবর্তে, বিএনবিসি একটি নির্মাণ সাইটে কাজের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলদের কী করা উচিত সে সম্পর্কে বিশদ বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করেছে, এবং স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, মালিক-ঠিকাদার এবং মালিক-পরামর্শদাতার মধ্যে কাজ নিয়ে কোনও আইনি চুক্তি থাকলেও এই কোডের অধীনে মালিক তার কোনও দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবেন না।

সংগঠনের স্বাধীনতা এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার
বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও তাতে যোগদানের অধিকার প্রদান করে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলীর উল্লেখ আছে:
ক) ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সময় কর্মক্ষেত্রে বা বাইরে শ্রমিকরা সুরক্ষিত থাকবে; এবং
খ) ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে তাঁদের সম্মতি ছাড়া এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বদলী করা যাবে না;

ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের জন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠান-পুঞ্জে কর্মরত শ্রমিকের ন্যূনতম ২০ শতাংশের সমর্থন প্রয়োজন। সংখ্যাগত এই বাধ্যবাধকতায় নির্মাণ শ্রমিকদের একটি বড় অংশ ইউনিয়ন গঠন থেকে বঞ্চিত হয়, কারণ এটি তাদের ইউনিয়ন গঠন ও যোগদানের স্বাধীনতায় বাধা দেয়। এ বাধ্যবাধকতা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং যোগদানে শ্রমিকদের অধিকারের মানদণ্ডের সাথে- এমনকি বাংলাদেশ স্বাক্ষরিত আইএলও কনভেনশন ৮৭-এর সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ নয় ।

যৌথ দরকষাকষির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ অনেকগুলো বিধান আছে। যেমনঃ দরকষাকষির অধিকার, দরকষাকষির পরিসর ও প্রক্রিয়া, শিল্প-বিরোধ মিমাংসা বা নিষ্পত্তির পদ্ধতি, ধর্মঘটের অধিকার, লে-অফকালে শ্রমিকের সুরক্ষা, ত্রিপক্ষীয় আলোচনা বা পরামর্শের বিধান অন্তর্ভুক্ত আছে।

একটি প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন সিবিএ বা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (Collective bargaining agent—CBA) হিসেবে কাজ করতে পারে। তবে, সিবিএ যদি কোন দাবিতে ধর্মঘট ডাকতে চায় তাহলে আইনের বিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের ৭৫ ভাগ কর্মীর সম্মতি প্রয়োজন হয়। ইউনিয়ন গঠন বা ধর্মঘট ডাকার পূর্বশর্ত হিসেবে এসব আইনী ধারা কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ে শক্তিশালী কোন পদক্ষেপ নিতে নিরুৎসাহিত করে বা বাধা দেয়।

৩. নির্মাণ শ্রমিকদের অধিকারের বর্তমান অবস্থা

‘নির্মান’ কাজের পরিসর, ধরন, সুবিধা-অসুবিধা

> বাংলাদেশের নির্মাণ খাতে বেশ কয়েক ধরনের কাজের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। যার মধ্যে আছে—রাজমিস্ত্রির কাজ, বৈদ্যুতিক কাজ, রঙ করার কাজ, পানি সরবরাহ এবং পয়:নিষ্কাশনের লাইন তৈরি, পাইলিং, বাঁশ ও লোহার কাজ, রড বাঁধাই, ঝালাই, ও কাঠের কাজ, ছাদের স্থাপনা, গ্লাস ও অ্যালুমিনিয়ামের কাঠামো স্থাপন, টাইলস ও মোজাইকের কাজ, ঢালাইয়ের আগে রড বাঁধা ইত্যাদি।

এই গবেষণায় দেখা গেছে, বেশিরভাগ কর্মক্ষেত্রে ৩০ জনের কম শ্রমিক কাজ করছে এবং ছোট কর্মক্ষেত্রেই মহিলারা বেশি নিয়োগ পাচ্ছেন। জরিপভুক্ত ৯৩ শতাংশ মহিলা উত্তরদাতা এমন নির্মাণ সাইটে যুক্ত ছিলেন যেখানে পাঁচ জন বা তার থেকেও কম শ্রমিক কাজ করেন।

ব্যাপারটা উল্টোভাবে পুরুষ কর্মীদের বেলায় ঘটে। নির্মান কাজের পরিসর যত বড় —পুরুষ কর্মীদের নিয়োগের প্রবণতা তত বেশি। উদাহরণস্বরূপ, এই গবেষণায় ৫৩ শতাংশ পুরুষ উত্তরদাতা এমন নির্মান সাইটে কাজ করেন যেখানে শ্রমিক সংখ্যা ১১ থেকে ৩০ জন।

নির্মাণ খাতে কাজের সুযোগ পাওয়ার বিষয়ে লিঙ্গভেদে ভিন্ন ধারণা রয়েছে। নারী শ্রমিকরা বিশ্বাস করেন যে, তাদের জন্য এই খাতে কাজের সুযোগ পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। এই বিষয়ে ব্যাখ্যাটি এমন যে, মহিলাদের কিছু কিছু নির্দিষ্ট ধরনের নির্মাণ কাজের প্রতি অনাগ্রহ আছে। আবার কিছু ধরনের নির্মাণ কাজে তাদের পর্যাপ্ত দক্ষতার অভাব রয়েছে বলে তারা মনে করে, যেমন, পানি ও পয়:নিষ্কাশন লাইন বাধার কাজ বা বৈদ্যুতিক কাজ। এছাড়া নির্মান কাজে যোগদানের বিষয়ে নির্মাণ কাজের সাইটে নারীর নিরাপত্তা ভাবনার বিষয়টিও প্রকাশ পেয়েছে।

অনেক নির্মাণ কাজ ঋতুভিত্তিক এবং আবহাওয়ার উপর অনেকটা নির্ভর করতে হয়। ফলে বছরের সবসময় সব ধরনের কাজ হয় না। বর্তমান গবেষণায় দেখা গেছে, শ্রমিকরা প্রতি মাসে গড়ে ১৫ থেকে ২৫ দিনের মতো কাজ করেন (এই হিসাব বর্ষাকালের বাইরে অন্য ঋতুর)। নারীদের কাজ পাওয়া বা কাজ করার হার পুরুষদের সর্বনিম্ন হারের তুলনায়ও কম।

আনুষ্ঠানিক বনাম অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের পরিপ্রেক্ষিত থেকে তুলনা করলে, সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৯০ শতাংশেরও বেশি নারীকে দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়। সমস্ত কর্মীদের বেলায় যে হার প্রায় ৮০ শতাংশ। আবার কাজের চুক্তির সময়ভিত্তিক ধরনেও নারীরা পুরুষকর্মীদের চেয়ে সুবিধায় অনেক পেছনে। সচরাচর পুরুষ কর্মীদের মাসচুক্তিতে কাজ পাওয়া বা পিসরেটে কাজ করার হার বেশি।

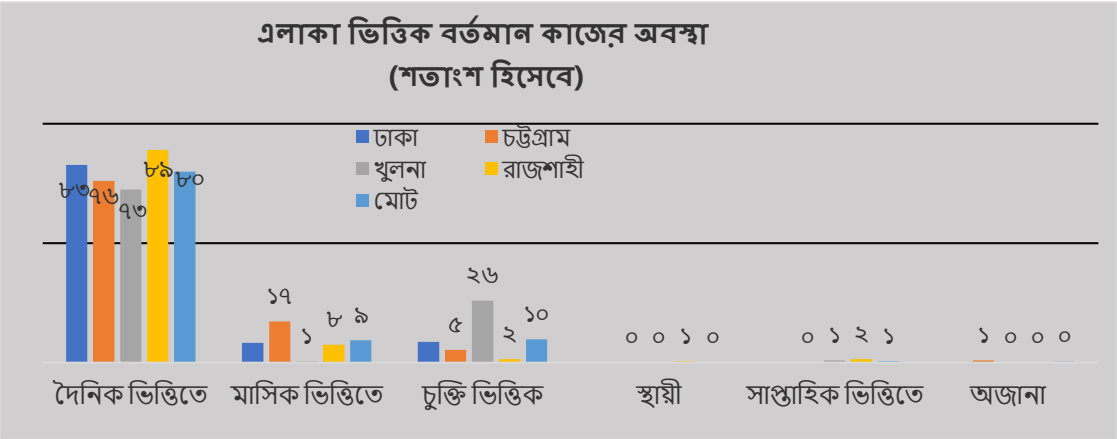

কাজের স্থায়ীত্ব এবং নিরাপত্তা

যেহেতু বাংলাদেশে নির্মাণ খাতে কাজের ধরনটাই অনানুষ্ঠানিক ধাঁচের সেকারণে শ্রমিকদেরও নানান অনানুষ্ঠানিক উপায়ে কাজ খুঁজে নিতে হয়। কখনো সাব-কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে, কখনোবা সর্দারের সূত্রে।

চলতি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৪০ শতাংশ শ্রমিক নির্মাণ কাজে পাঁচ বছর বা তার কম সময় ধরে আছেন। ২০ শতাংশের বেশি কাজ করছেন ৬ থেকে ৮ বছর। বাকিরা নয় বছর বা তারও বেশি সময় ধরে কাজ করছেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে মাত্র ৬ শতাংশ শ্রমিক নির্মাণ কাজে ২০ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। সংখ্যাটি কম হওয়ার কারণ হয়তো এই যে, এই কাজে শারীরিক পরিশ্রম বেশি হওয়ার কারণে খুব কম জনের দীর্ঘসময় এই পেশায় টিকে থাকার সক্ষমতা থাকে।

> 'দিন শেষে যদি দেখা যায় কাজের সামান্য কিছু রয়ে গেছে তখন ব্যক্তি-মালিকরা ঠিকাদারকে বলেন এইটুকু শেষ করে গেলে তার সুবিধা হবে—সময় ও অর্থ বাঁচে। তখন ঠিকাদার সেই অনুরোধ রাখেন আমাদের বাড়তি সময় কাজ করিয়ে। সচরাচর আমরা অতিরিক্ত ঐ কাজের জন্য কোন টাকা পাই না।´-- দলভিত্তিক আলোচনাকালে (এফজিডি) একজন শ্রমিক

সাধারণত, নির্মাণ কাজে শ্রমিকদের কর্ম জীবন সল্প মেয়াদ হওয়ার কারন হল— হয় কাজের পুরোটা শেষ হওয়ার আগেই কোন কারণে কাজ ছেড়ে চলে যাওয়া, বা ছাটাই হওয়া। ৭১ শতাংশ শ্রমিক বলেছেন, তারা তিন মাস বা তারও কম সময় ধরে বর্তমান কাজে আছেন।

যদিও নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, এবং সার্ভিস বই কাজ বা চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, উত্তরদাতাদের মাত্র তিন শতাংশ শ্রমিকের কাছে নিয়োগকর্তার দেয়া পরিচয়পত্র ছিল এবং মাত্র ১০ শতাংশ বলেছেন তাদের সার্ভিস বুক দেওয়া হয়েছে। হাজিরা উপস্থিতি হিসাব সম্পর্কে জানা গেছে যে, মাত্র ৪৮ শতাংশ উত্তরদাতার নিয়োগকর্তা এ বিষয়ে দৈনিক তথ্য রাখেন।

> *'বাংলাদেশে নির্মাণ শ্রমিকদের কাজের কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ, প্রায় সকলেই তারা দৈনিক ভিত্তিতে কাজ করেন।.. .. যেকোন সময় তাদের কাজ ছেড়ে চলে যেতে হতে পারে বা কোম্পানি কর্তৃক ছাঁটাই হতে পারে, কারণ শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রেই কর্মীদের কোন নিয়োগপত্র'থাকে না— একজন সাক্ষাৎকারদাতার মতামত*

লিখিত নোটিশ ছাড়া এই খাতে প্রায়ই শ্রমিকদের বাদ দেয়া বা ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটে যা ২০০৬-এর শ্রম আইন এর শর্ত লঙঘন করে। কিন্তু, যেহেতু এখানে কাজে যুক্ত হওয়ার ধরন অনানুষ্ঠানিক ধাঁচের ফলে এরকম বেআইনী ছাঁটাইয়ের শিকার হয়েও তারা প্রতিকারের কোন যথাযথ উপায় খুঁজে পান না। এই গবেষণায় উত্তরদাতাদের ৬৯ শতাংশ বলেছেন, নোটিশ ছাড়া ছাঁটাইয়ের ঘটনা তাদের কর্মক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক নিয়ম। কেবল ৩৪ শতাংশ বলেছেন, ছাঁটাইয়ের সময় শ্রমিকরা সবসময় ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন।

শোভন কর্মঘণ্টা

কাজের সময়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বেশিরভাগ নির্মাণ শ্রমিক সচরাচর আট ঘণ্টা কাজ করেন এবং এই বিষয়ে লিঙ্গগত কোন পার্থক্য পাওয়া যায়নি। তবে, শ্রমিকদের মধ্যে যারা দিনে আট ঘন্টারও বেশি সময় কাজ করার বিষয়ে জানিয়েছেন তাদের অধিকাংশই পুরুষ।

ওভারটাইমের বেলায় বাংলাদেশে প্রতিদিনকার আইন অনুমোদিত সীমা হল দুই ঘন্টা। যা প্রায়ই লঙ্ঘন হয় বলে জরিপকালে জানা গেছে । ৭৮ শতাংশ কর্মী বলেছেন, গত বছর তারা দিনে দুই ঘণ্টার বেশি ওভারটাইম করেছেন। পুরুষ উত্তরদাতাদের ৮০ শতাংশ এবং নারী উত্তরদাতাদের ৬৫ শতাংশ এরকম বলেছেন। এ পরিস্থিতির আরেকটা উল্লেখযোগ্য দিক হলো, প্রায় ৮০ শতাংশ শ্রমিক বলেছেন যে ওভারটাইম করার বিপরীতে তারা সঠিকভাবে তাদের প্রাপ্য মজুরি (সাধারণ কর্মঘণ্টায় প্রাপ্ত মজুরির দ্বিগুণ হারে)পাননি। ।

মজুরি

বাংলাদেশ সরকার সর্বশেষ ২০২১ সালের আগস্টে নির্মাণ খাতের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে। কিন্তু এই গবেষণায় দেখা গেছে, শ্রমিকদের মাত্র পাঁচ শতাংশ ন্যূনতম মজুরির ঐ মানদন্ড সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

সাধারণভাবে, নির্মাণ খাতের শ্রমিকদের মজুরি খুব কম - মাসের হিসাবে ১০ হাজার টাকা থেকে ২০ হাজার টাকার মধ্যে (ডলারের হিসাবে ৯০ থেকে ১৮০ ডলার) হবে। আনুষ্ঠানিক খাতের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা যায় এমন নির্মাণ কোম্পানিগুলোতে শ্রমিকদের মাসিক গড় মজুরি ১৪ হাজার টাকা পাওয়া গেছে। আর, ব্যক্তি-মালিকানায় নিয়োগ করা শ্রমিকদের বেলায় গড় মজুরি পাওয়া গেছে মাসিক ১৩ হাজার টাকা।

বাস্তবায়ন তদারকির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ না থাকায় সরকার ঘোষিত মাসিক সর্বনিম্ন মজুরির তুলনায় নির্মাণ খাতে কর্মীরা কতটা কম মজুরি পায় তার প্রমান হিসেবে একজন রাজমিস্ত্রীর উদাহরণ দেয়া যায়। জরিপে দেখা গেছে, রাজমিস্ত্রিরা গড়ে বেতন পান ১২ হাজার ৬২৭ টাকা। অথচ সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি কাঠামোতে রাজমিস্ত্রিদের ন্যূনতম মজুরি ২৪,৫৮০ টাকা। নির্মাণ খাত সংশ্লিষ্ট প্রায় সব কাজেই শ্রমিকরা সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরির কেবল ৪৪ থেকে ৬৩ শতাংশ পর্যন্ত পান বলে দেখা গেছে।

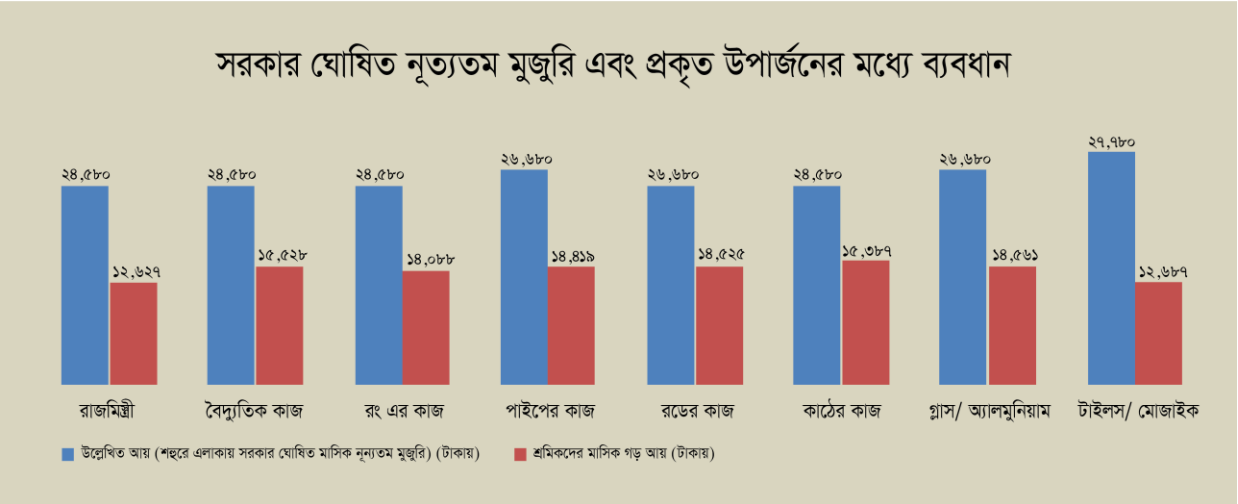

নির্মাণ খাতে সচরাচর মজুরি দৈনিক ভিত্তিতে দেয়া হয়। শতকরা নয় ভাগ উত্তরদাতা শ্রমিক বলেছেন তাঁরা একটা নির্দিষ্ট দিনে মজুরি পান। যা সাধারণত মাসের ৭ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে হয়ে থাকে। ১৬ শতাংশ বলেছেন, তাদের মজুরি পাওয়ার কোন নির্দিষ্ট তারিখ নেই। এক্ষেত্রে, মজুরি পেতে পেতে অনেক সময় পরের মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত গড়িয়ে যায়, যা ২০০৬ সালের শ্রম আইনের লঙ্ঘন।

> *"একজন নির্মাণ শ্রমিকের পক্ষে পর্যাপ্ত উপার্জন অসম্ভব, কারণ তাদের কাজ করতে হয় দৈনিক ভিত্তিতে; দিনান্তে সেই মজুরিও তারা ন্যায্যভাবে পায় না।"*
>
> --একজন সাক্ষাৎকার দাতার বক্তব্য

লিঙ্গভিত্তিক মজুরি বৈষম্য বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে নারী কর্মীরা বলেছেন, একই কাজ করার পরও তাঁরা পুরুষ সহকর্মীর চেয়ে ২০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত কম মজুরি পান। এই ব্যবধান সাধারণত কাজের ধরনের উপর নির্ভর করে। যেমন, রাজমিস্ত্রির কাজে ব্যবধান কম হলেও রঙ করার কাজে সেটা বেশি হয়। মজার বিষয় হল, মজুরি পার্থক্যের কারন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে অনেক নারী শ্রমিক পুরুষ সহকর্মীদের মতোই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাদের মতে, "এটা স্বাভাবিক যে, পুরুষ শ্রমিকরা নারী শ্রমিকের চেয়ে বেশি মজুরি পাবেন। কারণ পুরুষ শ্রমিকরা যতটা কাজ করতে পারে একই সময়ে একজন নারী শ্রমিক ততটা কাজ করতে পারেন না।"

সকল শ্রমিক অবশ্য একই ধরনের কাজের জন্য পুরুষ ও নারীর মজুরির পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। ৬২ শতাংশ নারী এবং ৩৫ শতাংশ পুরুষ শ্রমিক এই মজুরি বৈষম্যর বিষয়ে ওয়াকিবহাল না থাকার কথা বলেছেন।

এটা হয়তো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক (৬৩ শতাংশ) বলেছেন, নির্মাণ কাজ থেকে পাওয়া মজুরি তাদের পরিবারের মাসিক খরচ মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। এই গবেষণায় দেখা গেছে, অনেক শ্রমিক পরিবারের মাসিক আয় ও ব্যয়ের ব্যবধান ৯০০ থেকে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত (৮ থেকে ২৭ ইউএস ডলার)।

বৈষম্য, হয়রানি এবং সমান সুযোগ প্রশ্ন

নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে বৈষম্যের অভিজ্ঞতা নিত্যনৈমিত্তিক। উত্তরদাতাদের ৩০ শতাংশ দাবি করেছেন যে, মজুরি, ওভারটাইম, ছাঁটাই এবং কর্মক্ষেত্রের অন্য কোন নির্ধারিত কাজে তাদের নিজেদেরই বৈষম্যের অভিজ্ঞতা আছে অথবা তাঁরা সেরকম ঘটনা দেখেছেন। বৈষম্যের সবচেয়ে সাধারণ রূপ হলো লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য। পরিবারের প্রতি দায়িত্ব ও সেই দায়িত্ব পূরণের সামর্থ্য সম্পর্কিত পিতৃতান্ত্রিক বিশ্বাস থেকেই শ্রমিক এবং ঠিকাদার উভয়ের কাছে নারী-পুরুষের মধ্যে কাজের বন্টন এবং মজুরি পার্থক্যের বিষয়টি ন্যায্য থেকে যায়।

সাধারণত, শ্রমিকরা উপরোক্ত বৈষম্যের প্রতি উদাসীনই বলা যায়। যেমন, লিঙ্গীয় বৈষম্যের বিষয়ে, ৪৫ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, তাঁরা জানতেন না যে, নারীরা পুরুষ কর্মীদের মতো কাজের বেলায় সমান সুযোগ পাবেন।

অনেক নির্মান সাইটে হয়রানি একটি অন্যতম সমস্যা হিসেবে প্রতীয়মান। ৩০ শতাংশ শ্রমিক দাবী করেন যে, তাঁরা কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার হয়েছেন। যার মধ্যে মৌখিক অশোভন কথাবার্তা বেশ নিয়মিত (৯২ শতাংশ শ্রমিক এরকম বলেছেন) ।

হয়রানির ক্ষেত্রে, প্রতিকারের উপায় খুব কম: ৬৮ শতাংশ শ্রমিক জানিয়েছেন, কর্মক্ষেত্রে হয়রানির অভিযোগ জানানো এবং প্রতিকার পাওয়ার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। এক্ষেত্রে এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ১৮ শতাংশ শ্রমিক বলেছেন, অপ্রাতিষ্ঠানিক 'বা অন্য কোন উপায়ে অভিযোগ তুলে ধরা যায়। যার মধ্যে আছে কন্ট্রাক্টর, সাব-কন্ট্রাক্টর, প্রধান মিস্ত্রি, শ্রমিক সর্দার বা ফোরম্যানদের বিষয়টা জানানো। কেননা, কর্মক্ষেত্রে এরা প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে থাকে।

শিশুশ্রম এবং জবরদস্তিমূলক শ্রম বা বন্ডেড লেবার

"কর্মক্ষেত্রে নারী নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা নেই"

শিশুশ্রম বিষয়ে, ২২ শতাংশ শ্রমিক বলেছেন, তাঁদের নিয়োগকর্তারা কম বয়সী শ্রমিক (যাদের বয়স ১৮-এর নিচে) নিয়োগ করেছেন এবং প্রায় সকল উত্তরদাতা দাবি করেছেন, নিয়োগদাতারা নিয়োগের সময় বয়স যাচাই করার জন্য যথাযথ নিয়ম অনুসরণ বা পরিশ্রম করেননি।[1]

যদিও ২০০৬ সালের শ্রম আইনের বিধানের আলোকে কিশোর-কিশোরীদের নির্মাণ কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে, তবে সেটা হতে হবে 'হালকা কাজ'। তবে আইনে হালকা কাজের ধরন সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা নেই। ৪৩ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, নির্মাণ ক্ষেত্রে অপ্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকদের সাথে ভিন্ন আচরণ করা হয়। তাদের সাধারণত সহজ এবং কম বিপজ্জনক কাজ দেয়া হয়। এতে এই বার্তা মেলে যে, বাকি ৫৭ শতাংশ উত্তরদাতা কিশোর-কিশোরীদের তাদের বয়সের বিবেচনায় অনুপযোগী কাজে নিয়োজিত হতে দেখেছেন।

কাজ, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত জীবন

সাধারণত নির্মাণ খাতে বিভিন্ন ছুটি এবং সাপ্তাহিক ছুটি দেয়ার রেওয়াজ নেই। মূলত দৈনিকভিত্তিক নিয়োগ-প্রথার কারণে এরকম ঘটে। জরিপে অংশ নেয়া ৯৩ শতাংশ শ্রমিক বলেছেন যে, তাঁরা কোন সবেতন জাতীয় ছুটি বা সাপ্তাহিক ছুটি পাননা। একইভাবে, কোন শ্রমিকের কাছ থেকে এরকম তথ্য পাওয়া যায়নি যে, তারা কখনো অন্য কোন ছুটি যেমন, বাৎসরিক বা , নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ করেছেন।

যদিও শ্রমিকরা মজুরিবিহীন সাপ্তাহিক ছুটি নেন—কিন্তু অনেকে (২৭ শতাংশ) বলেছেন সেরকম ছুটি পাওয়ার প্রক্রিয়াটিও 'সহজ নয়' এবং অনেকে ভয় করেন যে, এই ছুটি নেয়ার কারণে নিয়োগদাতার তরফ থেকে ভবিষ্যতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

[1] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, এই গবেষণার জন্য পরিচালিত জরিপেও পাচ শতাংশ উত্তরদাতা ছিলেন এমন শ্রমিক যাদের বয়স নিয়োগের বৈধ বয়সসীমার নিচে।

এই পেশায় থেকে স্বাভাবিক সংসার জীবন চালিয়ে যাওয়া বেশ কষ্টকর। আমি বাড়ির বাইরে কাজ করে যাচ্ছি চার বছর ধরে। বাড়িতে একটি কন্যাশিশু আছে। তার সঙ্গে পর্যাপ্ত সময় কাটাতে পারি না। মাঝে মাঝে বিষয়টা আমাকে বেশ দুঃখ দেয়।

-- একজন নির্মাণ শ্রমিক ছুটি বিষয়ে কথা বলতে যেয়ে এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

একইভাবে, অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া নারী শ্রমিকদের সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া হয় না এবং এই বিষয়ে অসচেতনতার মাত্রাও উল্লেখযোগ্য। জরিপ থেকে পাওয়া তথ্য থেকে দেখা যায়, ৫৬ শতাংশ শ্রমিক জানেন না নির্মাণ খাতে এরকম মাতৃত্বকালীন ছুটির চর্চা আছে কিনা।

পেশাগত জীবনে এরকম সীমাবদ্ধতা ও বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, ৫৫ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, তারা নির্মাণ খাতে কাজ করতে এসে কাজ ও জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারছেন না।

সামাজিক নিরাপত্তা

২০০৬ সালের শ্রম আইন সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নিয়োগকর্মালিকের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে অনেক বিধান রেখেছে (যেমন, ভবিষ্য তহবিল, গ্রাচুইটি, দুর্ঘটনায় আহত-নিহত হওয়ায় ক্ষতিপূরণ এবং যৌথ বীমার বিষয়ে)।

এই গবেষণা নিশ্চিত করছে যে, নির্মাণ শ্রমিকরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত। এর অন্যতম কারণ হল—১) তারা জানেন না যে কাজ পাওয়ার মধ্যদিয়ে তারা কী কী সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা পাওয়ার অধিকারী; ২) নিয়োগকর্তারাও শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কিত এসকল বিষয়ে অবহিত করার দায়িত্ব পালন করেন না। সমীক্ষার তথ্যে পাওয়া গেছে, নিয়োগকর্তারা তাদের কি ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা দিতে বাধ্য সে বিষয়ে প্রায় ৬০ শতাংশ শ্রমিক সচেতন নয়।

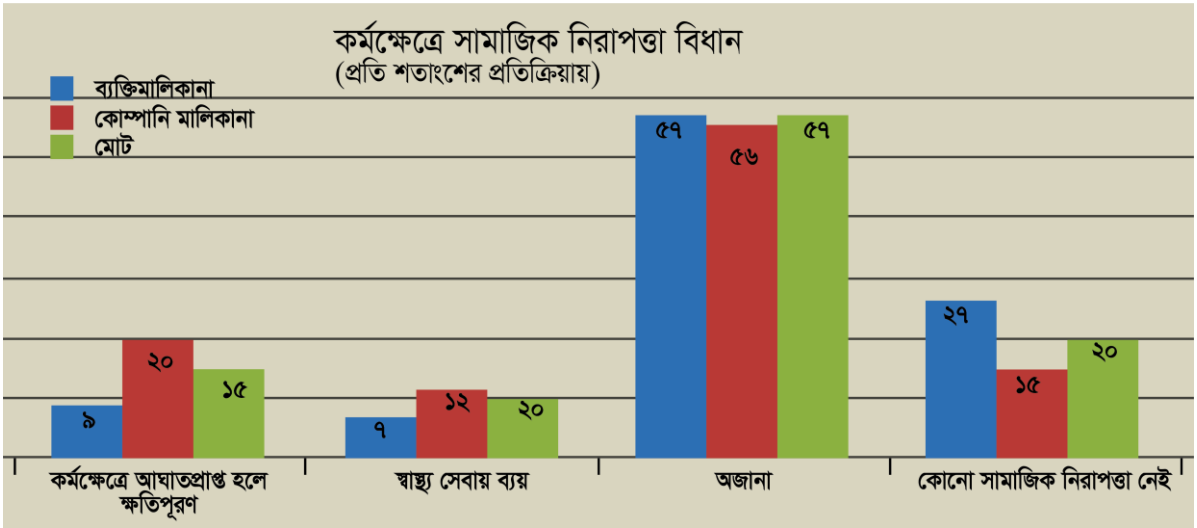

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা

নির্মাণ খাতে কাজের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো এতে ঝুঁকি ও বিপদ আছে। এর কারণ হল, কাজের প্রকৃতি এবং নিয়মিত ভারী নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার। পেশাগত এই ঝুঁকি সম্পর্কে কর্মীদের উপলব্ধি হল: ২৪ শতাংশ শ্রমিক তাদের হাত বা পা কাটার বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন (সাধারণত এটাই সবচেয়ে বেশি ঘটে)। পরবর্তী বিষয় ছিল উপর থেকে পড়ে যাওয়ার শঙ্কা, তড়িতাহত হওয়া, কাজের সময় পেশী বা রগে টান লাগার মতো বিষয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিয়োগকর্তারা শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) প্রদান করতে বাধ্য। কিন্তু জরিপে দেখা যাচ্ছে, প্রায় ৬৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, তারা কাজের জন্য পিপিই পাননি।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রশিক্ষণের বিষয়ে, ৯১ শতাংশ বলেছেন, ঝুঁকি প্রতিরোধ এবং হ্রাসের উপায় সম্পর্কে শ্রমিকরা কোনো প্রশিক্ষণ পান নি। যদিও সরকারি পরিদর্শন ব্যবস্থা শ্রমিক প্রশিক্ষণ ও পিপিই প্রদানের কাজে নিয়োগকর্তাদের অনুপ্রাণিত করতে পারে, কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, নির্মান খাতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মতো সংস্থাসমূহের কার্যক্রম বিরল।

> "আন্তর্জাতিক মানের নির্মাণ সংস্থাগুলোর প্রকল্প-সাইটে পেশাগত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিযুক্ত থাকেন। ঢাকায় এরকম কর্মকর্তা নিয়োগ করা প্রকল্প সংখ্যা বর্তমানে পাচ-ছয়টির বেশি নয়। ওয়ার্ক ওর্ডার বা কাজের আদেশ এবং চুক্তি অনুযায়ী এসব প্রকল্প পরিচালকরা শ্রমিকদের জন্য নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ করে। তবে কোন কোন মধ্যস্বত্বভোগী অনেক সময় সেগুলো শ্রমিকদের না দিয়ে নিজেরা রেখে দেয়। আন্তর্জাতিক কাজের আদেশ (work order) গুলো সকল ধরনের নিরাপত্তা ও পরিষেবা সুবিধার (service benefit) বিষয়গুলো মেনে চলে। তবে স্থানীয় কোম্পানি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে কোন নিরাপত্তা শর্ত এবং পেশাগত সুবিধার বিষয়গুলো অনুসরণ করা হয়না। কেবলমাত্র অল্প কিছু বড় বাংলাদেশী কোম্পানিগুলো এসব নিয়ম-কানুন মেনে চলে।"
>
> একটি ছোট নির্মাণ কোম্পানির মালিকের বক্তব্য

ট্রেড ইউনিয়ন এবং বিবাদ মীমাংসার উপায়

মাত্র ৪.৫ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন, তাদের নির্মাণ সাইটে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার সুযোগ ছিল। তবে এরকম সুযোগের পরও উপরোক্ত উত্তরদাতাদের ৪০ শতাংশ ইউনিয়নের সদস্য হননি। ইউনিয়ন গঠনের উদ্যোগ ও তৎপরতার হারও কম দেখা গেছে। যেসব নির্মাণ সাইটে ইউনিয়ন ছিল না সেখানকার ৮৯ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, তারা তাদের কর্মক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের কোন উদ্যোগে দেখেননি বা এ বষয়ে কোন আলাপ-আলোচনা শোনেন নি।

ইউনিয়নে কম সদস্য হওয়ার কারণগুলির মধ্যে রয়েছে – এ বিষয়ে শ্রমিকদের আগ্রহের অভাব। ইউনিয়ন কীভাবে শ্রমিকদের সাহায্য করতে পারে সে বিষয়ে জানাবোঝার বা জ্ঞানের অভাব, এবং সময়ের অভাবে শ্রমিকরা ইউনিয়নের কার্যক্রমে অংশ নেয়না।

ইউনিয়ন না থাকার কারণে, স্বভাবতই নির্মান খাতে মালিক-শ্রমিক বিরোধ নিষ্পত্তি অনানুষ্ঠানিক পথে হয়ে থাকে। কখনো আলাপ-আলোচনা, বা কখনো দরকষাকষির মাধ্যমে শ্রমিক এবং নিয়োগ দাতারা (যেমন ফোরম্যান, ঠিকাদার, শ্রমিক সর্দার প্রমুখ) বিবাদিত বিষয়ে সমঝোতায় আসতে চেষ্টা করে। জরিপে দেখা গেছে, শ্রমিকরা যখন ব্যবস্থাপনা কতৃপক্ষের কাছে কোন সমস্যা উত্থাপন করে, তখন তা তারা ব্যক্তিগতভাবে (৫০ শতাংশ) বা অন্যান্য শ্রমিকদের নিয়ে (৪৩ শতাংশ) করে।

৪. সুপারিশ ও কৌশলগত নির্দেশনা

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নির্মাণ খাত বাংলাদেশে অনেক মানুষের জন্য অর্থ-উপার্জনের বিশাল সুযোগ তৈরি করেছে। তবে কোম্পানিগুলোর বিদ্যমান আইন অনুযায়ী শ্রমিক অধিকারের বিষয়ে সীমিত ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ, শ্রমিকদের নিজেদের অধিকার বিষয়ে অজ্ঞতা, এবং মানবাধিকার সম্পর্কে অসচেতনতার কারণে বর্তমানে এই খাতটি একটি অনিশ্চিত খাত হিসেবে চিহ্নিত ।

কাজেই নির্মান খাতের এ সকল অসামঞ্জস্যতা মোকাবেলা এবং এ খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের অধিকারসমূহ সঠিক এবং কার্যকর বাস্তবায়নে উপরে উল্লিখিত তথ্য-উপাত্তের আলোকে কিছু সুপারিশ ও কৌশলগত নির্দেশনা তুলে ধরা হল।

কর্মসংস্থান-সম্পর্ক বিষয়ে

- নির্মাণ খাতের নিয়োগদাতাদের অবশ্যই ২০০৬ সালের শ্রম আইনের আলোকে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীদের নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র এবং প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এসকল সরকারি নথি না থাকার কারণে শ্রমিকরা নিয়োগকর্তাদের দ্বারা শোষণ-নিপীড়নের ঝুঁকির মধ্যে থাকে। আর যদি নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র ইত্যাদি কাগজপত্র থাকে তাহলে শ্রমিকদের প্রোয়োজনীয় সুরক্ষা ও প্রতিকার/ক্ষতিপূরন দাবী করার অনেক বেশি সুযোগ থাকে।
- সকল নির্মাণ সাইটে আইন অনুযায়ী কর্মঘণ্টা নির্ধারণ এবং তা প্রয়োগ করতে হবে। বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ থাকতে হবে এবং ২০০৬ সালের শ্রম আইনের নিয়ম অনুযায়ী প্রতি ঘন্টা মজুরির দ্বিগুণ হারে ওভারটাইমের মজুরি প্রদান করতে হবে।
- নির্মাণ শ্রমিকদের আইন অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরি এবং মজুরির সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য সুবিধা দিতে হবে এবং সংশ্লিষ্টরা তা যথাযথভাবে মানছে কি না সেটা নিশ্চিত করতে কলকারখানা পরিদর্শন বিভাগ কর্তৃক নিয়মিত তদারকি থাকতে হবে।
- কর্মস্থলের পারস্পরিক শোভন আচরণের যথাযথ পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রত্যেক মালিককে কর্মস্থলে হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করতে হবে।

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য

- নির্মাণ কাজে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি যখন শ্রমিক নিয়োগ দেবেন তখন তাদের কর্মসংস্থান নীতি অবশ্যই পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন এবং ২০০৬ সালের শ্রম আইনের এ বিষয়ক নির্দেশনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে

যেমন— ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ ও ব্যবহার সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা, নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ এবং কর্মস্থলের পেশাগত ঝুঁকি ও বিপদ বিষয়ে তথ্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে ন্যূনতম মানদন্ড মেনে চলা।

কল্যাণ ও সামাজিক সুরক্ষা

- নির্মাণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকদের অবশ্যই তাদের শ্রমিকদের পেনশন স্কীম ও গ্রাচুইটি সুবিধার আওতায় আনতে হবে। পাশাপাশি, কর্মীদের আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনের দিক বিবেচনা করে যথাযথ বীমা কর্মসূচি যেমন- ব্যক্তি, গ্রুপ, স্বাস্থ্য, দুর্ঘটনা বা জীবনবীমার ব্যবস্থা করতে হবে
- নির্মাণ খাতের শ্রমিকদের জন্য একটা কল্যাণ তহবিল প্রতিষ্ঠা করতে হবে যা গড়ে উঠবে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক, এবং সরকারের ত্রিপক্ষীয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে। এরকম তহবিলের লক্ষ্য হবে সেসব নির্মাণ শ্রমিকদের সহায়তা করা যখন বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে তাদের কাজের অভাব হয় বা অন্য কোন কারণে ব্যাপক কর্মহীনতা তৈরী হয় ।

শ্রম সম্পর্ক এবং সামাজিক সংলাপ

- শ্রমিকদের তাদের পেশা-সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ও সমিতি গঠন ও তাতে যোগ দেয়ার সুযোগ দিতে হবে এবং এরূপ সংগঠন করার কারণে কারো বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়া যাবে না।
- কর্মস্থলে সম্ভাব্য হয়রানি নিয়ন্ত্রণে রাখতে নির্মান প্রতিষ্ঠানগুলোকে আনুষ্ঠানিক এমন একটি কাঠামোগত প্রক্রিয়া চালু করতে হবে যার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে সম্ভাব্য হয়রানি প্রশমনের জন্য আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা যাবে।

কর্মক্ষেত্রে মানবাধিকারের প্রচার ও সুরক্ষা

- কর্মক্ষেত্রে নির্মাণ শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে জানাতে ও তাদের নিরাপত্তা ও পরিপূর্ণতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান সেবাসমূহের বিষয় অবহিত করতে তাদের নিয়ে নিয়মিত বৈঠকের আয়োজন করতে হবে।
- মালিক সংগঠনগুলোকে অবশ্যই কর্মক্ষেত্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং উন্নতির জন্য দায়িত্ব নিতে হবে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে কর্মক্ষেত্রের মর্যাদা এবং শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- ২০০৬ সালের শ্রম আইন যেসব বিধি-বিধানের কথা বলে এবং শ্রম বিষয়ক আরও যেসব আইন-কানুন রয়েছে সেগুলো কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- কর্মক্ষেত্র পরিদর্শনের পরিধি আরও বৃদ্ধি করতে হবে এবং পরিদর্শকদের ক্ষমতাও বাড়াতে হবে—যাতে তারা স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্বশীলদের সঙ্গে নিয়ে নির্মাণ সাইটগুলোর অনিয়মসমূহ সম্পর্কে তদন্ত করতে পারে।
- নির্মাণ খাতে মানবাধিকারের সুরক্ষার উন্নয়ন সাধনে শ্রম অধিকারকেন্দ্রীক জাতীয় কর্ম পরিকল্পনাকে ব্যবসা ও মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের নির্দেশনা-নীতিমালার আলোকে পুনর্গঠন করতে হবে।

-০-